
বিষবৃক্ষ

4·4

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বঙ্কিম-গ্রন্থমালার'র ৪নং গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের



বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও দামোদর গ্রন্থমালার সম্পাদক

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

BISHA BRIKSHA
CODE NO. 4-64-005

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

সম্পাদকের ভূমিকা

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একজাতীয় উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আর-একজাতীয় উপন্যাসের সাহায্যে তিনি আমাদের সমাজ-দেহে যে-সব পাপ প্রবেশ করেছে, তা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন,—সেই সব পাপ আর অনাচারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে। 'বিষবৃক্ষ' হলো এই দ্বিতীয় জাতের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

'বিষবৃক্ষ' ব'লে কোন গাছ নেই। যে-গাছের ফলে বিষ থাকে, যে-ফল খেলে মানুষ মরে যায়, তাকেই বলে—বিষবৃক্ষ। অর্থাৎ, যে-সব অন্যায় আচরণ আমরা সমাজে করি, সেই অন্যায়গুলিই হলো বিষবৃক্ষ, তার ফলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে, সেই সব অন্যায় সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা—সংযমকে মহৎধর্ম্ম ব'লে জীবনের প্রত্যেক কাজে পালন করবার আদেশ দিয়েছেন। যে অসংযমী, সে শুধু নিজেকেই ধ্বংস করে না, তার বিষের ছোঁয়ায় তার সমাজও ধ্বংস হয়ে যায়। বিষবৃক্ষে সেই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন্ শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নন্, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিক্‌টা ভাঙিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায়

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি-বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এন্‌ট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী-কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়ই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল,

তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন···বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী-চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া

গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব জন্মদাতা··· সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

বিষবৃক্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, তুফানের সময়, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও! ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না।" নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব। নগেন্দ্রবাবুর বয়স তিরিশ মাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে — বাতাসে নাচিতেছে — রৌদ্রে হাসিতেছে — আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভূজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে। কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কালো বিন্দুর মত পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক

রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র। প্রথম দুই একদিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল। নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।"

অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোফে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। দাঁড়িরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সার্সী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকা-সজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। এমন সময়ে রহমৎ মোল্লা মাঝি বলিল যে, "হুজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয় নদীতীরে ঝড়বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে, বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী। নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন।

ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু-কষ্টে আলোক-সন্নিধি উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীপ নির্ব্বাণ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ্-লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্যসমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টক-খণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবন-প্রদীপেও তাহাই। শয্যাপার্শ্বে এক সুন্দরী বালিকা। এর নাম কুন্দনন্দিনী। নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

একদিন ইহাদিগের সম্পদ্ ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল।

কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি। তাই বৃদ্ধ তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছুদিন যাক, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ-কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সেদিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন?

আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে? এই গভীর অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখ নেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল, আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন পিতৃ-মুখ প্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে কুন্দনন্দিনী একা পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রহিল। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে তখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বায়ু গর্জ্জন করিতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। ক্ষীণ প্রদীপ তৈলাভাবে নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়া পূর্ব্বগামিনী

নিশীথ-সময়। ভগ্নগৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা!" কেহ উত্তর দিল না! কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না। দিবারাত্র জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন বাহু'পরি মস্তকরক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, তাহার বহুকাল-মৃতা করুণাময়ী জননী তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি তাহাকে ভূতল হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানি যে, তুই বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্র-লোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন নক্ষত্রলোক দেখিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" ইহা শুনিয়া জননী যেন মৃদু-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া আমাকে মনে করিয়া আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আকাশপ্রান্তে

একবার চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে তুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই তুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।"

কুন্দ দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্তি রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহা সদাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে জননী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী যুবতী দেখিল। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।" বলিতে বলিতে সহসা তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই সেই

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল, কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। কুন্দ চাঁপার কাছে গত রাত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিল।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর, উহার বিবাহ দিও, তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন তোমাদিগের বাটীতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।" নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত; কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া একজন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থ-কন্যার উপায় হয় এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না।

চাঁপা কহিল, "ও কি, দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলিনির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এ-ই সে-ই।"

চাঁপা কহিল, "এই কে?"

কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া

বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না। কেবল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু শ্যামবাজারে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার মাসীর বাড়ী খুঁজিয়া পাইলেন না। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম কমলমণি। বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব— উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। সূর্য্যমুখী উত্তর দিল ঃ

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি, তা ত জান। যদি একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া



...শয্যাপার্শ্বে এক সুন্দরী বালিকা। এর নাম কুন্দনন্দিনী। নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না... [পৃষ্ঠা—৪

আসিও। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না। কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

তারাচরণ কে তা' পরে বলিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, তিনজনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিনজনই হাহাকার করিবেন।

বজরা সাজাইয়া নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন। কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তারাচরণ

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা একজন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতায় কোন অফিসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন-পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশু-সন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী তারাচরণকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীন বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ একপ্রকার মোটামুটি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। তিনি দেবপুর নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে তারাচরণ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক-বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া এবং "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা 'তত্ত্ববোধিনী' হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতদের দ্বারা দেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন—"তোমরা ইটপাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ি-জ্যাঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঞ্জরায় পূরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা বলিবার বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন বলিয়া তাহার বিবাহ কোন নীচু ঘরে দিতে রাজী হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর

রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ নগেন্দ্র দত্তকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল এক একটি বৃহৎ পুরী। এই তিন মহল অন্দরমহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে নীলমেঘখণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর-বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাটীর বাহিরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর নিকট আনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্য্যমুখী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রপ্রসঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে

দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া, তাহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা, তাহাকে কহিলেন যে, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুন্দনন্দিনী বিধবা

কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাড়ী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি এক বিপদে পড়িলেন। তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা-ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ককালে মাষ্টার সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমার সময় হয় তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফর্ম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ

হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" বিবাহ হইলে পর দেবেন্দ্র বলিলেন, "কৈ হে, তুমিও কি ওল্ড্ ফুলদের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়ে দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্রবাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয়, পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। দেখাই দেখাই করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র একদিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। দেবেন্দ্র তাহার রূপ-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহাকে আর ভুলিতে পারিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন; সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র তারাচরণের গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে শুনিয়া সূর্য্যমুখী তারাচরণকে এমন ভর্ৎসনা করিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসরকাল কাটিল। তাহার পর কুন্দনন্দিনী বিধবা হইল। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। এইবার বিষবৃক্ষের বীজবপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছুদিন কালাতিপাত করিল। এক দিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি; সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। এই দলে সকল বয়সেরই মেয়ে ছিল। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত, এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল। সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমন সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। তাই অচেনা বৈষ্ণবীকে দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "ওমা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলনফেরন—এ সকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী, মা-ঠাকুরাণীরা গান শুনবে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো" এই ধ্বনি চারিদ্দিকে আবাল-বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানেই কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাহিয়া আমার মুখ শুকাইতেছে, আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও। আমি জাতি-বৈষ্ণবী নহি।"

এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সে স্থান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৈষ্ণবী হাত-মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা ?"

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ ?"

কুন্দ। না।

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ী আমার বাড়ীতে আছেন। তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন। সে ত এখানে আসিতে পারিবে না, তা' তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না ?

কুন্দনন্দিনী বৈষ্ণবীর সঙ্গে যাইতে রাজী হইল না। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে কোথাও যাইবে না। এমন সময়ে সেখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গায়িলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইল-পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃতকক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্রবাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না।

দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি, দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুক-

সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না।

দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণ ধন-গৌরব পুনর্ব্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশবাবু নামে ঐ গ্রামের আর এক জন জমিদারের একমাত্র কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখা-পড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর এবং সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনও সুখেরই আশা নাই। সুখ দূরে থাকুক,—হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠান ভার হইল। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল, দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন এবং সেই দিন হইতে গৃহ-প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোক হইয়াছিল; সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন।

কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্ত বিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্‌ম বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। একটা ফিমেল-স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন

না। বিধবা-বিবাহের বড় উৎসাহ। জেনানারূপ কারাগারের শিকল-ভাঙ্গার বিষয়ে তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার একমত। উভয়েই বলিতেন, মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর বৈষ্ণবীবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। পরে তানপূরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক-বাদক-দল আসিল। তাহারা প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর পত্র

"শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু। আমি আপনার চিতা আপনিই সাজাইয়াছি। পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় কর!

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে যান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি,

তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন; তাহাকে বিনা দোষে ভৎর্সনা করিতে শুনিয়াছি।

একথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী; কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে। কিন্তু কি করি ভাই, তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চাহিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম। এসকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাইবাবুকে এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদের দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে আমার ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাইবাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে, ইতি। সূর্য্যমুখী।"

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—

"তুমি পাগল হইয়াছ। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর! স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

দিনকয় মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব?" বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। তাহাকে বলিয়া সূর্য্যমুখী স্বামীর জন্য ঔষধ আনাইলেন! সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন, নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ। শুধু রাগ নয়। একদিন রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখনও মদ্যপান করিতেন না

সূর্য্যমুখীর অনুনয়-বিনয়ে নগেন্দ্র মদ্যপান ত্যাগ করিলেন না। নগেন্দ্রের বিষয়-সম্পত্তিতে অমনোযোগের ফলে সব কিছু নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

একদিন তিন চার হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারীর দরওয়াজায় যোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে ?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই—"একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া আফিসের আয়ব্যয়ের হিসাব-কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় বসিয়া এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজী সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি গিয়া শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমায় এই সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে। কিন্তু তোমাকে পত্র না পড়াইলে, আমার আহার-নিদ্রা হইবে না।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হাতে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি, তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল।"

কমল। কর্‌তে হবে এই, সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়েছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয়, এমন লোক তার কে আছে?—বুদ্ধি যা কিছু আছে তা সতীশবাবুর। তাই সতীশবাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশবাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে! তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হ'লেই সুতরাং কমলমণিও যাবে।"

কমল। শুধু কি তাই? সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "তা সত্যসত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে?'

কমল। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আফিস সারিয়া আইস।

শ্রীশ। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তবে তুমি একা যাও।

কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল।

নগেন্দ্রকে দেখিয়া কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল! কোথা থেকে?"

কমল মুখ নত করিয়া নিরীহ ভালমানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে।" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁফ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সহিত কমলমণির এইরূপ আলাপ হইল—"ওলো কুঁদী—কুঁদী—মুদী—হুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক্ হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়ে থাকবি, আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরস্থলা ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ 'দিদি' বলিতে আরম্ভ করিল। কয়েকদিন অবস্থান করার পর কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না ভাই। আর দু'দিন থাক। তুমি গেলে আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন,

"আমার কি কাজ করিবে?" কমলমণি মুখে বলিলেন, "তোমার শ্রাদ্ধ"—মনে বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। কুন্দনন্দিনী বালিসে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন।

চুলবাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। তুমি আমায় ভালবাস।

ক। কেন—আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?"

কুন্দ ঘাড় নাড়িল, "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল, "কি?

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব?"

কুন্দ বলিল, "কি, বল?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?

কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝেছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?" তাহার পর কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "কুন্দ! আমার সঙ্গে চল।"

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "নহিলে নয়।—সোণার সংসার ছারখার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, 'যাবি? মনে করিয়া দেখ?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরা

এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান ধরিল। এদিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গাহিতে লাগিল। গান ভাল না লাগাতে কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "গিন্নিমশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয় তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না। চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কিনা সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী কমলকেও ডাকিয়া দেখাইলেন।

কমল বলিলেন, "কি তা? কথা কহিতেছে—কহুক না। মেয়ে বৈ ত আর পুরুষ নয়।"

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ, তার ঠিক কি?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। আমার বোধ হয়, কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনি জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা!

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন। হীরার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়, এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া একটু ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। এই পরিচারিকাদের হীরা প্রধানা। হীরা কায়স্থকন্যা। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে, প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে তাহার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। না।

সূর্য্য। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়, আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এ সকল কথা যদি ঠিক জেনে

এসে বলতে পারিস্, তবে তোকে নূতন বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূর্য্য। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনই ওর পাছু পাছু না গেলে, ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূর্য্য। কিন্তু দেখিস্, যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।

এমন সময়ে কমল ফিরিয়া আসিলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুশী হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"

সূর্য্য। কি নিবি?

কমল। ও একটি বর চায়, ওর একটি বিয়ে দাও।

হীরা। আমার মনের মত একটি বর আছে।

সূর্য্য। কে লো?

হীরা। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"না"

সেইদিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেঃ ভাল, সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলাম না কেন? যদি না মলাম ত এখানে এলাম কেন? এই মাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়? তা হ'লে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হ'লে হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? কেহ শুনিতে পাবে না—নগ—নগেন্দ্র! ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কিন্তু আজি না। আমাকে কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারব না; তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে তাদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি, মরিবই মরিব।

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর কুন্দ ধীরে ধীরে সরোবর-সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—নগেন্দ্র।

ন। কুন্দ! কলিকাতায় যাইবে?

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

ন। কুন্দ, ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ? কাঁদিতেছ কেন?

ইচ্ছাপূর্ব্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—শুন কুন্দ, আমি বহু কষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, "না।"

ন। কেন কুন্দ? বিধবা-বিবাহ কি অশাস্ত্র?

কুন্দ আবার বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তবে 'না' কেন? বল—বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না?

কুন্দ বলিল, "না।"

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল!

তারপর মদ্যপান করিয়া তিনি প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পারিষদেরা সকলে চলিয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে জানলার দিকে কি একটা খড়খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, 'কে খড়খড়ি চুরি

করে ?” কোন উত্তর না পাইয়া জানালা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, একজন স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি, অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না! তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিলেন। তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ চারিদিক আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—“তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি—কোথাও দেখেছি হে।”

তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া বলিল, “আমি হীরা।”

এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র মদের নেশায় দুই একবার ঢুলিয়া শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল।

পরদিন প্রাতে হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দ্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না। সূর্য্যমুখী ও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। কমল সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পর বলিলেন—“কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবীকে আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে! তুই যা, তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হতে এখনি দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।”

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে

থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, "ও যাহা বলে বলুক, আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া অনাথিনী সংসার-সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে। কোথায় পথ? কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই—কোন্ দিকে কোথায় যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর কোথায়ই বা যাইবে?

তবু কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল; বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল। শেষে পিট্ পিট্!—পট্ পট্!—হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীরের ছোট চাল, কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে দ্বারের নিকটে বসিল; দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল।

দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ। দ্বারের শব্দ তাহার কানে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুকুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আসিল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি ?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি ? কি ? কি ? আবার বল ত ?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে ? ঘরের ভিতর এস ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল,—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার রাগ

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক। দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের

ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ী স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল। বাহির দুয়ারের শিকল কে যেন সাবধানে নাড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও, গঙ্গাজল!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর কাছে।

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্রবাবু ডেকেছে।" হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমায় বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, সেদিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।" হীরা বলিল, "কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। বুঝিলাম হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে আসিয়াছিলে। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমি পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র হীরাকে বহু অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়,

আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।”

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেককাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তদের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন, বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিলে,

কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অনুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপী হীরা এই সব দেখে শুনে কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া একবার লোভ হইয়াছিল, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে শয্যা রচনা করিয়া উভয়ে শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি? পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে কুন্দকে যদি দত্তবাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দিবে—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে দিই, তাহ'লে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সেও প্রাণ থাকিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়! কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর ব্যাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ী মুখো হইবার মত নাই। আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই। কেন বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ।

কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? এখন আমার হলো কিছু টাকার দরকার; আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বৈ আর টাকা কোথা? সবাই জানে যে, নগেন্দ্রবাবু কুন্দকে ভালবাসে। বড়মানুষ লোক মনে করলেই বিবাহ করিতে পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দু'জনে একটা চটাচটি হয়, তাহ'লে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির করবে না! এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটি আমায় করতে হবে। নগেন্দ্রকেই কুন্দনন্দিনী দিব।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্তা হইল। ছল করিয়া আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

একদিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মুনিব বাড়ী আসিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্তা হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর একজন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভু-পত্নীর প্রসাদ পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহার সহিত অকারণে ঝগড়া বাধাইয়া প্রভু-পত্নীর কাছে নালিশ করিল। সূর্য্যমুখী বিচার করিয়া দেখিলেন, হীরারই দোষ, তথাপি হীরার অনুরোধে

কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "উহাকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়; তখন "আচ্ছা চল্লেম" বলিয়া হীরা চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়েছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশী আমাকে গালি দিয়েছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন!

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয় হীরে, আসল কথা কি বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে—কারে কখন্ কি বলেন ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, "সে দিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন—তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

ন। সে কি কথা ?

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ বাড়ী যা, কাল ডাকব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এইজন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃষ্টি করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক! তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে ?" নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম ?"

ন। কোন দুর্ব্বাক্য ?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত তাহাই বলিলেন। বলিলেন, "কখনও কোনও কথা আমি তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব ? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম, পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া ভরসা করিয়া বলি নাই। আমার অপরাধ লইও না। আমি সকল বলিতেছি। তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে বিবৃত করিলেন।

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তবে একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কুন্দ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলে তাহা সত্য কি না ?"

সূ। সে কথা ভাবি নাই, কারণ তখন আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল।

ন। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসি।

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত হইয়াছি। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না।"

ন। না, তা নয় সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।

সূর্য্যমুখী স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা।"

ন। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আরও এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে-বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে কথার ছলে সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়।

এইরূপে কিছুদিন গেল। মালতী গোয়ালিনী হীরার বাড়ী আজকাল প্রায়ই যায়। দেখিল, হীরার গৃহের একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালাচাবি আঁটা থাকিত। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালাচাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ, তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগল।—মানুষটা কে? শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। একদিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল; হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওমা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল

—"কুন্দ ঠাকুরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে।"

সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হিহি করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা 'পার্টি' ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পরদিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

একদিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে

সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই। ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখন তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক, আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল।

ক্রমে প্রভাত হইল—ঝাউতলায় আর ত বসিয়া থাকা যায় না—কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থ কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবল হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেখানে বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। হয়ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীর বেষ্টিত। খিড়কীর দ্বার মুক্ত না হইলে, তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কীর দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ তাহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যান-মধ্যস্থলে একটি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত লতামণ্ডপ। লতামণ্ডপ-মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তরনির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি

গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না, পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেইদিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি!"

কুন্দ তখন উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অবতরণ

সেইদিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন, এঘর ওঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে

লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিলে কেন? কুন্দ কোথায়?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে —আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা যাহা জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা—আর একটুকু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কাণা মেঘ ছিল দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে তাই বসিতে বলিতে পারিল না।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া, জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর দিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে ব্রাণ্ডি-ফ্লাস্ক বাহির করিয়া বিনা জলে পান করিলেন এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল কটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গান করিতে করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘেঁাকর ঘেঁাকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন সিপাহীর কাছে কিনিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র বেহালা হাতে লইয়া এক প্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুর ভাবে গায়িলেন। গান শুনিয়া ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী! মনে হইবার পরই হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি? তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

হীরা রাগিল—বলিল, "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভালমন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? তুমি আমাকে কুলটা

ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই। আমি অবলা স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে চলিয়া যান।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খোস-খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশবাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোকজন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচীহস্তে কার্পেট তুলিতেছেন,—কেশ বেশ একটু আলুথালু।

এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্নমনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ।

"তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখান বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাকে পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও একটা খোস-খবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে ··এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে

দোষ কি? তুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিলে তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন। শ্রীশচন্দ্র পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা।"

কম। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা, না পত্রটা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে—দাদা বুঝি জোর করে বিয়ে করিতেছে।

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব।

"এ কথা বলার পর আর বোধহয়, কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধহয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

কাহার আপত্তি ?

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে ?

কমল। না পারি, দাদার সুমুখে মরিব।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুইজনের কেহই একথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন ?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া স্পষ্টস্বরে সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায় ?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে, সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন; শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে এক রুদ্ধ গবাক্ষ সন্নিধানে অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক

বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু চিনিলেন যে, সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া, কমলমণি, বিবাহ হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশচক্ষু কোটরে পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে ;—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো ?"

সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুইজনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন, ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে, তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি ?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ-বৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা

হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না?" বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিঁয়া গেল;—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হ'লে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ—সে সকল ত তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল!

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে, তোমার অন্তর্দ্দাহ হতেছে। তবে কেন বল, 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের

আধখানা আজও 'আমি'তে ভরা, নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন ?

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই।

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি ? বল না ?"

সূ। কিছু না।

কমল। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। কমল কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমি পাগল! নচেৎ কা'ল ঘরে যাইবার সময় বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন ?"

———

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ-পত্র

শোকের প্রথম বেগ সংবরণ হইলে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ :—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব ; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না এবং আমার সন্ধান পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে ?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম,—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী-পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও, আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ু শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ কি ?

যে বিষবৃক্ষের বীজবপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া থাকেন। যে কেহ আপন উছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন,—সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না,—তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই

বৃক্ষ মহা তেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; কিন্তু ইহার ফল বিষময়। যে খায়, সেই মরে। চিত্তসংযমের পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরুর উপদেশকে শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী;—এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল! প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে স্থিরসংকল্প। পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরাগী ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাক্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ; নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত অপরিমিত অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না। দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দ-নন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই, কেননা, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ-সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও

সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল। পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমন বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র পাঠাইলেন। কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কতদূর যাইবেন? এক-পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে দিনমান গেল।

বস্তুতঃ, শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখন পদব্রজে বাটীর বাহির হন নাই। কতদূর যাইবেন? বাড়ী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্রবাগানে শয়ন

করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল; চিনিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, আসুন।"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে, আসুন। বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" তখন সূর্যমুখী ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি কি আমাদের মা-ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না বাছা।"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা-ঠাকুরাণী।"

সূ। তোমাদের মা-ঠাকুরাণী কে গা?

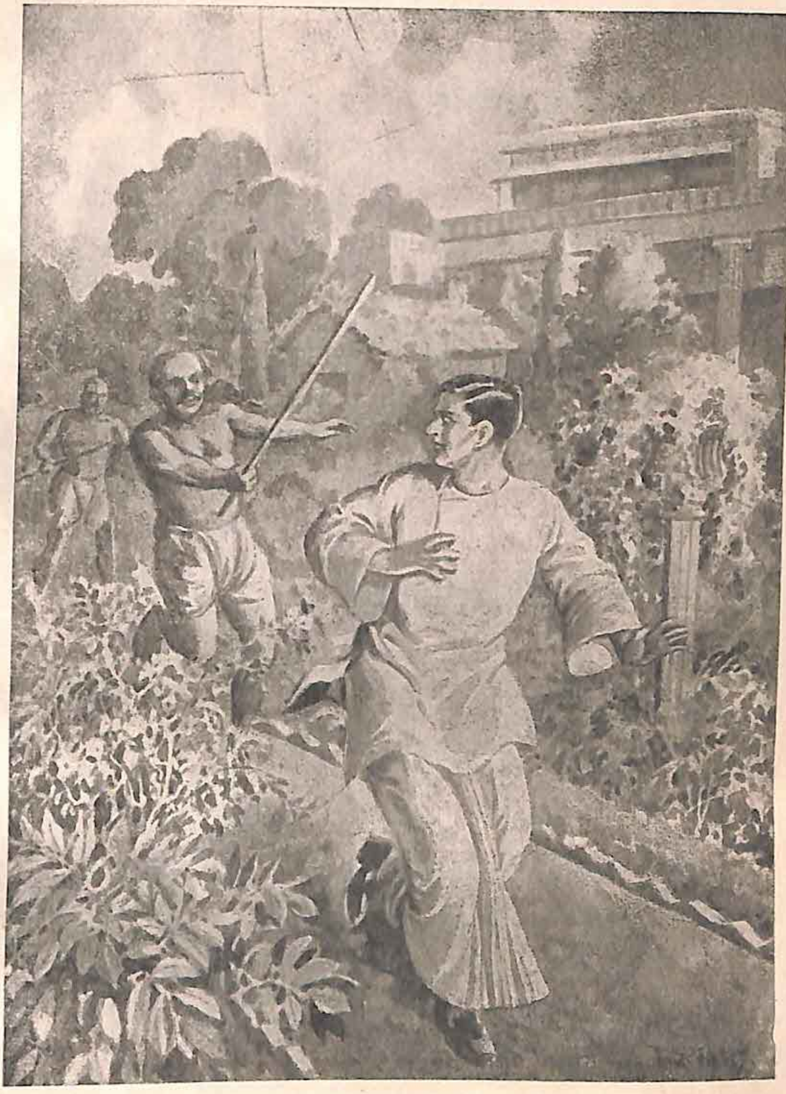
বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূ। আমার গায়ে কি সোণাদানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?

বুড়ী ভাবিল, "তাও ত বটে!"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল



...দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া তলামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল।...... [পৃষ্ঠা—৭৭

না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্যসিদ্ধি হইল না—অথচ অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা 'মা-ঠাকুরাণী' বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনাব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল—তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া, মরিলে ভাল ছিল।"

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এই সময় কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। "আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দ্দাহ হয়। তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন, কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কমলমণি আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। তাই তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দ-নন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন,—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা-আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে।" অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

———

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষের ফল

নগেন্দ্রনাথ তাঁর এক বন্ধুকে লিখিলেন :—

"এক মাস হইল, সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে-দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব, নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে—আমি কি করিব?"

নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা দাসী কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং তাহাকে তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। দেওয়ানজী এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।"

শুনিয়া হীরা রোষ-বিস্ফারিত-লোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সেই ক্ষমতা।"

শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে হীরাকে কেহ শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুর সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। এমন সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্রনাথ কৌশলে হীরার মন ভুলাইবার জন্য চাটুবাদ সুরু করিলেন।

কিন্তু হীরা তাহাতে প্রতারিত হইল না। কিন্তু বাহিরে ধরা দিল না। তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মনের বাসনার কথা উপস্থিত করিলেন—কুন্দকে দেখিবেন।

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা করিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

হীরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে বলিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি প্রভৃতি দ্বাররক্ষকরা পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুর মধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে তাহাদের কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। তেওয়ারি-গোষ্ঠী কিছুদূর পশ্চাৎদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান্ কর্ত্তৃক 'শ্বশুরা' 'শালা' প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এখন আমরা শুনিয়াছি।

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল দিলেন। হীরার লঘুপাপে এমন গুরু শাস্তি হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—একজন মাত্র পথিক ভিজিয়া পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল। পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী। বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলো অপেক্ষা আঁধার ভাল।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন,

' 'কে তুমি পথে পড়িয়া আছ ?" অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি ?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন, "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক।"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সে কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা, হর, ঘরে আছ গা ?"

কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই! ঠাকুর কবে এলেন ?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌ছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। প্রদীপ জ্বলিল। দেখিলেন, তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন, এবং শত স্থানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, এখন সে নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল, যেন মৃত্যু নিকটে।

ব্র। ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ-সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।

হরমণি তখন ব্রহ্মচারীর আদেশমত তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্কবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ

দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধহয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির ঘরে দুধ ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে, সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল,—"আমি কোথা?"

ব্র। তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?

স্ত্রীলোক কহিল, "অনেক দূর।"

হর। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা? পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল।

হরমণি কহিল, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

———

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আশা পথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

বৈদ্য পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

বৈদ্য বিদায় লইলে ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম।

সূ। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্র। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হোক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না।

সূ। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এইজন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্র। মা, আমি তোমার সন্তান-সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব।

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়,—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষ বিকাশ হইল। তখন আবার

ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি ?"

ব্র। কতদূরে সে ?

সূ। হরিপুর জেলা।

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন :—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনার ভার্য্যা শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে,—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস—মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত শীঘ্র আসিবেন। আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকটে পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে

পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দেওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমাব নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান এই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্ম অবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তজন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল, মুহূর্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী ত্যাগ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাঁড়ে-গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে

মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতীর দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ-প্রকাশ করিলেন না—ইতিপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না! সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

তারপর মিষ্টালাপ পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্র তানপূরা লইলেন এবং গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীত-লহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শুনিয়া একেবারে বিমোহিত হইল।

দেবেন্দ্র তানপূরা রাখিয়া সযত্নে হীরাকে সরস সম্ভাষণ করিলেন। হীরা সব ভুলিয়া গেল।

———

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। এমন সময়ে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাতজনে সেলাম করিল,—কেননা, তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল। কেহ ভাবিল দারোগা; কেহ ভাবিল বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র

শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনী মামলার সুরৎহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি ছেলেমানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতি ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায় একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন ?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ, তিনি একস্থানে স্থায়ী নহেন ; সর্ব্বদা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

ন। কবে আসিবেন তাহা কেহ জানেন ?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন এখান হইতে গিয়াছেন ?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন ?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর তার সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে ?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত ?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না, কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল,—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্রনাথ চৌকী হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন, কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

———

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

এতদিনে সব ফুরাইল

এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এতদিনে সব ফুরাইল।"

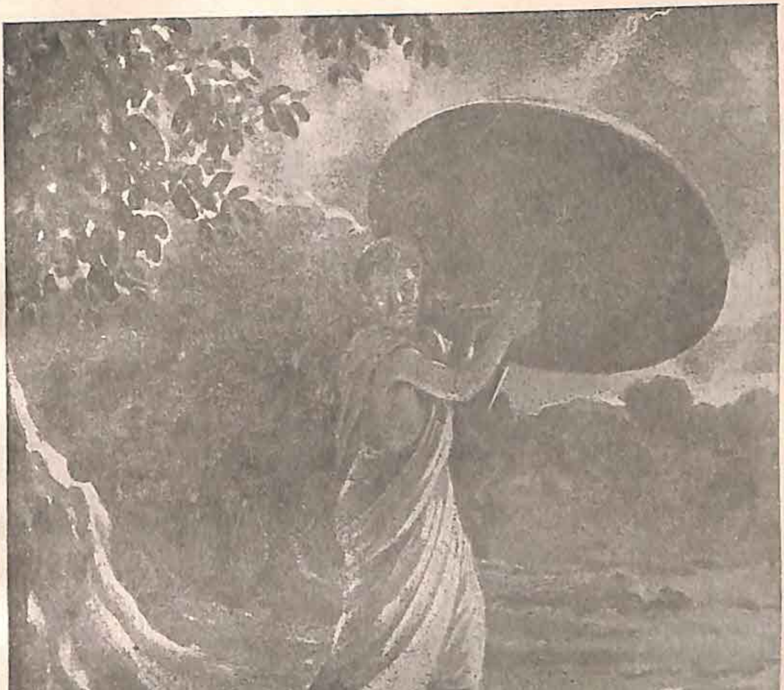
নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেইজন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী, ভদ্রাসন-বাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখাপড়া উকীলের বাড়ী নইলে হইবে না। অস্থাবর সকল সম্পত্তি কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়-ব্যয়ের কাগজপত্র সকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সে খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাইবেন, সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশপর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন

বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিনপাত করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছে! ইহারই মধ্যে সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজ যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে—ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি সব দিলে—তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন।

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন; সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখ ভোগ ত্যাগ করিব; ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। যেখানে



...বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?" ...

[পৃষ্ঠা—৭৮

যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব ; যে অর্থ নিজব্যয়ার্থে রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণমাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। প্রায়শ্চিত্ত! নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

উনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময় শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্ত-বাহিত ব্যাগখানি রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন ; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এইমাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন! বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" একথা সহ্য হয় না, "সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন" এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য! কেন না, গত কল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন; গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না—শুনিলেন যে, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।"

নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। তাঁহার শোক রোদনের অতীত।

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথাভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই!

———

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাই হইল।

দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রকে শতমুখে তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া উদ্যান হইতে বিদায় করিলেন।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসা করিত। সে চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ীর সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শেয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সে শেয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজ হাঁড়ী খাইতে আসিলে, বিষ খাইয়া মরিবে। সদ্য প্রাণ নষ্ট নয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?"

চণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে। কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি

না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরিবে।”

হীরা বলিল, “তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতেছি।”

চণ্ডাল পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। চণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া হীরা অনেক রোদন করিল। “আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নইলে তাহার কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার আয়ি

“হীরার আয়ি বুড়ি।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি
দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।”

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ

বালকের পাল এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। ডাক্তারকে দেখিয়া, চিনিয়া বুড়ী কহিল, "হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা?"

ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার। কি হইয়াছে তোর?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবন-চরিত্র···হীরার ও হীরার মাতার—পিতার ও হীরার স্বামীর জীবন-চরিত্র আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহুকষ্টে—তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন। মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ, বাতিক, হীরা গর্ভে থাকা কালে তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। এবং ইহাতেই মরে। বুড়ী ভাবিল যে, মাতৃরোগ হীরা পাইয়াছে। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাঃ। তোর নাতনীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।

বু। তা' বাবা ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?

ডাঃ। ঔষধ আছে বৈ কি! উহাকে খুব গরমে রাখিস্ আর এই ক্যাষ্টর-অয়েলটুকু লইয়া যা।

বুড়ী ক্যাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে করিয়া চলিল। পথে একজন প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি?"

হীরের আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়েছে। তা, বাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া বলিল, "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। তা তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর্, আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারীবাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। যে উদ্যানে মালী নাই—ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজনে খাইত পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাহাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজী যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করাইয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দর বুক দুড়-দুড় করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজীকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানজীকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া আর ফিরাইয়া দিত না। সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে—দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম

শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত।

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে সেই মরিয়াছে।

কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হ'তে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন?" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যক কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রি হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রী ছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্কমূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ দিতে কাজে-কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিলেন। কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন।

কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? তবে আমি

কখনও সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না।" এই বলিয়া রোদন ত্যাগ করিয়া কমলমণি আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদাবাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন ?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী প্রথম প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; অধৈর্য্যের হ্রাস আসিয়াছিল; তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না। —কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল; নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

———

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত প্রদীপ

নগেন্দ্রের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। নিশীশকালে, পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্য শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একখানি শোফার উপর শয়ন করিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখোমুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছেন। তারপর ঘরের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘরের যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। নগেন্দ্র মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে

সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতি চিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? একদিন দোলে সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেওয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী একস্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পুরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ লোপ পাইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল।

ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিস? বালিস স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিস নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনীর? সন্দেহভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষা-

কারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপালদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্বদিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যে আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। কিন্তু তাহার আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে অশ্রু-পরিপূর্ণলোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানবীই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীমূর্ত্তির পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না। রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। চক্ষু না চাহিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!"

রমণী বলিলেন,—"সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ, উঠ! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বোস! আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনাবাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না। উভয়ে কত রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনে কি সুখ!

———

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

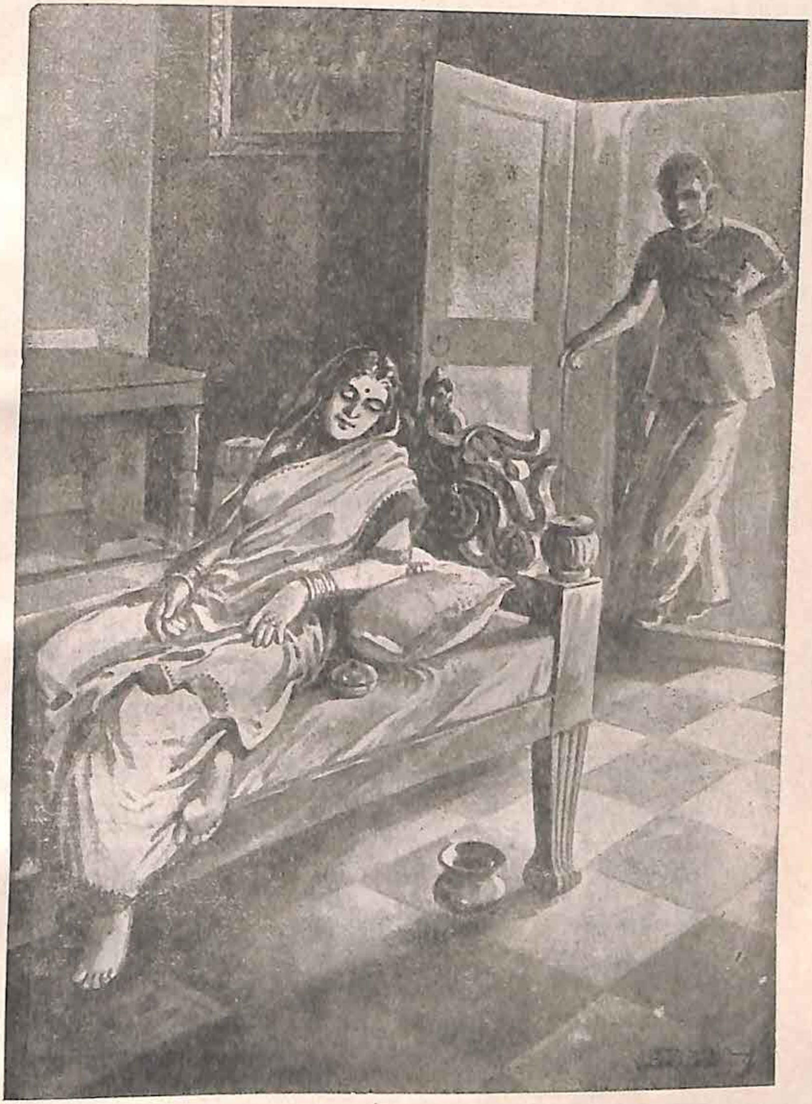
পূর্ব্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া তোমার উদ্দেশে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। শুনিয়া তিনি মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যেদিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেইদিনই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার একটি মারা গিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধহয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল; যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমানমাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত

বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছেন।

যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম তখনও খিড়কী-দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না; সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম, মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। কবাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু তুমি কি? তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

———



কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া বসিয়া ছিল—নগেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। [পৃষ্ঠা—১১৩

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল।

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয়বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ! তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম, আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসার সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া মাতা অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে কুন্দ বলিল, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে। কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে, কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন?"

কুন্দ। কোন কাথাবার্ত্তা বলেন নাই।

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সহিত দেখা হয় নাই।"

হীরা মনে মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা, এতে কি কাঁদ্‌তে হয়? কত লোকের কত বড়-বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ?"

'বড় বড় দুঃখ' আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এতদিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা" এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কাণে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিল। রাত্রিকালে অনেকবার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া ব্যথিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি, শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম।"

এই কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কাণে সেই 'আত্মহত্যা' শব্দ বাজিতেছিল।

হীরা কহিল, "যখন জানিলাম যে, সে আমাকে ভালবাসে না এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত, তখন আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পুরিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি।"

হীরা কৌটা খুলিয়া বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। এমন সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা কৌটা কুন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেল। কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

———

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া কোলাহল করিতেছে। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন; তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা ?" কথা কৌশল্যার কাণে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নাকি ? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজ দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

সূর্য্যমুখী কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে এখন আমার কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কমল ও সূর্য্যমুখী তাহার ঘরে গিয়া দেখিল সে বিষপান করিয়াছে।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এত দিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে কুন্দ তাহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র কহিল, "এ কি কুন্দ! তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখনি নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে,—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না।"

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ হাসিয়া কহিল, "তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি

অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল। কুন্দ কহিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে, জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ পর্য্যাঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া ভূমে শয়ন করিয়া নগেন্দ্রের অঙ্কে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিপুষ্ট কুন্দকুসুম শুকাইল।

———

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথা পাইল? যেন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ!

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্য হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। একবার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্র রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত। একদিন এক ভৃত্য আসিয়া কহিল, "একজন পাগলী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি দিল, 'আসুক।'

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল—"তুমি

আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল।

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

সমাপ্ত

বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাতুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাগ্রহী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯